International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

Codes of Medical Ethics: An Overview

Mr. Nilkamal Das[1], Prof. Dr. Papia Gupta[2]

[1]Research Scholar, Philosophy, Vidyasagar University
[2]Professor, Philosophy, Vidyasagar University

Abstract
Medical profession inevitably related with the well- being of patients through accurate diagnosis of the disease, skillful proper treatment blended with soecialized updated knowledge, cimmitment to take care. But along with these, an ethical boundary or strong code of moral guideline should be there in this profession also, like all others, which not only protect the best interests of patient and his or her decisions making rights but also maintain a healthy, honest, mutual relationship between Doctor and Patient based in trust and respect. This article aims to focus the fundamental four pillers of medical ethics, namely, patient's non-maleficience, beneficience, autonomy and justice with an explanation.

Keywords: Medical ethics, Hippocratic Oath, beneficience, non-maleficience, autonomy, justice, informed consent, confidentiality.

নৈতিকতার ধারণার মধ্যেই তার প্রয়োগের দিকটি আবশ্যিক ভাবে জড়িয়ে আছে, কারণ নৈতিকতা গড়ে উঠেছে ব্যক্তিমানুষের আচরণকে ভিত্তি করে। নৈতিকতা বলতে বোঝায় নীতি সম্পর্কিত বোধ বা অনুভব এবং সেই বোধ অনুসারী মানব ক্রিয়া বা তাদের কার্যকলাপের মূল্যায়ন। মানুষ সমাজে শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলানিষ্ঠ, সহাবস্থানমূলক যে জীবন যাপন করতে চায়, তাকে সুরক্ষিত করার জন্যই বস্তুতঃ এই নৈতিকতার বেড়াজাল আবশ্যক বা প্রয়োজন। এই নীতিসাপেক্ষতা বা নৈতিকতা যে কোন আদর্শ সুশৃঙ্খল সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তি স্বরূপ। এই নৈতিকতা বোধ বা নীতি পালনের ক্ষেত্রে আইনগত চাপ না থাকলেও সামাজিক, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বার্থ, ধর্মীয় পাপ-পুণ্যের ভীতি, সামাজিক প্রশংসা বা নিন্দার প্রভাব যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে তা অনস্বীকার্য্য। তবে এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা এইসব প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র বিবেকের কথা অনুসারে, নৈতিকতাকে মান্যতা প্রদান পূর্ব্বক তাঁদের যাবতীয় আচরণ সম্পাদন করে থাকেন। এই নৈতিকতার ব্যাপ্তি যে শুধুমাত্র পারিবারিক পরিসরে সীমাবদ্ধ - এমন নয়, তার বিচরণ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে পেশাগত জীবন তথা ব্যক্তির প্রতিটি পরিচয়, প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে। আমি এই প্রবন্ধে চিকিৎসা সংক্রান্ত নৈতিকতা বা Medical Ethics বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদানের চেষ্টা করেছি।

চিকিৎসা-নৈতিকতা প্রায়োগিক নীতিশাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশা যে সমস্ত নৈতিক বিধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, সেইগুলি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে এমন কিছু নিয়ম-বিধি আছে, যার মাধ্যমে এই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ পরিচালিত হবে এবং একই সঙ্গে তাদের আচরণগত ন্যায্যতা এবং অন্যায্যতার মূল্যায়ণ হবে। চিকিৎসা-নৈতিকতার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অর্ন্তভূক্ত হল- চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা, রোগীর যত্ন, রোগীর অধিকার, জীবন-সমাপ্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, রোগী-চিকিৎসকের সম্বন্ধ ইত্যাদি। বস্তুতঃপক্ষে চিকিৎসা সংক্রান্ত যেকোন আচরণ এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই নৈতিক বিধি বা নিয়মগুলি পালন বা অনুসরণ অবশ্যকর্তব্য। অর্থাৎ চিকিৎসা সংক্রান্ত নৈতিক বিধিগুলি যেকোন অনৈতিক আচরণের রক্ষাকবচস্বরূপ-যা নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, চিকিৎসা বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি মানবিকতার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়, কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের নিরিখে নয়।

পাশ্চাত্যে প্রথম এই নীতি নিয়ম সম্বলিত একটি নির্দিষ্ট আকার পাওয়া যায় হিপোক্রিটিক ওথ্ বা হিপোক্রিটিয় শপথের মধ্যে। ঐতিহাসিক মত অনুসারে,

চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত হিপোক্রেটিস (৪৬০খ্রিঃপুঃ -৩৬০ খ্রিঃপুঃ) বা দ্বিতীয় হিপোক্রেটিস চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরী করেন, যেটি পাশ্চাত্যের চিকিৎসা-নৈতিকতার প্রাচীনতম অভিব্যক্তি রূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। চিকিৎসকগণ এই মহৎ জীবিকায় প্রবেশ করার করার আগে মেডিকেল কলেজের স্নাতক অনুষ্ঠানে এই শপথ পাঠ করেন বা গ্রহণ করে থাকেন। 1500 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বিখ্যাত মেডিকেল স্কুল- University of Wittenberg তার স্নাতক মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য এই শপথ গ্রহণকে অর্ন্তভূক্ত করে। এরপর 1700 দশকের পরে নথিটি ইংরাজীতে অনুবাদ করে পাশ্চাত্যের মেডিকেল স্কুল গুলিতে নিয়মিতভাবে সমাবর্তনে ঐ শপথ পাঠ করা হতো। ইংরাজ চিকিৎসক থমাস পার্সিভাল (Thomas Percival) ১৮০৩ সালে প্রথম "medical ethics" বা "চিকিৎসা নৈতিকতা" শব্দটির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করেন তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের শিরোণাম রূপে। তিনি ঐ গ্রন্থে মূলত রোগগ্রস্ত ব্যাক্তিদের সেবা ও যত্নবিষয়ে নির্দেশিকা প্রদান করলেও চিকিৎসা পেশার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা বিষয়েও বিচার বিশ্লেষণ করেন। অর্থাৎ এটি চিকিৎসক ও শল্যচিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে উক্ত নীতিগত নির্দেশিকা স্বরূপ, যেখানে চিকিৎসকদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গেও বক্তব্য পাওয়া যায়। পারসিভাল গ্রন্থটিতে রোগীর অসুস্থতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে উপকারিতা নীতির সর্বাধিক গুরুত্বকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন, একই সঙ্গে রোগীর স্বাধিকারকে মান্যতা প্রদান করে রোগীর যে চিকিৎসা নির্বাচনের অধিকার আছে, তা উল্লেখ করেছেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশান পার্শিভালের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই প্রথম জাতীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত নৈতিক কোড বা বিধি গঠন করে। হিপোক্রেটিসকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক রূপে অভিহিত করা হয়, কারণ- তাঁর লিখিত প্রায় 70 টি গ্রন্থে বহু রোগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভিত্তিক বর্ণনা এবং বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের পরে তাদের চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। হিপোক্রেটিস শপথটি মূলতঃ আইওনিক গ্রীক ভাষায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হয়েছিল [১]। এই শপথের কিছু বিশেষ অংশ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক। শপথটি গ্রহণ করা হয়েছে একাধিক প্রসিদ্ধ রোগ নিরাময়কারী গ্রীক দেবতাদের নামে- যাদের মধ্যে আছেন - এ্যাপোলো (Apollo), যিনি সূর্য্য, সত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, রোগ নিরাময়কারী; এ্যাসকুলাপিয়াস (Asculapius); যিনি এ্যাপোলো পুত্র এবং ঔষধের দেবতা; হাইজিয়া (Hygeia) - এ্যাসকুলাপিয়াসের কন্যা এবং স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতার দেবী; প্যানাসিয়া (Panacia) সামগ্রিকভার স্বাস্থ্যের দেবী - এছাড়াও অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবীর নামে, তাঁদের সাক্ষী রেখে শপথ নেওয়া হয় যে - চিকিৎসক তাঁর ক্ষমতা এবং বিচার অনুসারে যাবতীয় অঙ্গীকার পালন করবেন। সেই অঙ্গীকারগুলি কেমন, সে বিষয়েও সামান্য দু'চার কথা বলা যেতে পারে এবং এখানে সেই শপথ গুলি উল্লেখ করা হল, যেগুলি সরাসরি আমার আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত – ১) আমি সেই খাদ্যতালিকা ব্যবহার করব যা আমার রোগীদের, আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং বিচার অনুযায়ী উপকার করবে এবং আমি তাদের কোন ক্ষতি করবো না।

২) কোন প্ররোচনার বশীভূত হয়ে আমি কাউকে বিষ প্রয়োগ করব না বা এমন কোন পরামর্শ-ও দেবো না । ৩) আমি আমার পেশা ও জীবন, উভয়কেই শুদ্ধ ও পবিত্র রাখবো, 8) রোগীর গোপনীয়তা রক্ষা করবো, ৫) আমি যে বাড়িতেই প্রবেশ করবো, অসুস্থদের সাহায্য করার জন্য প্রবেশ করবো এবং আমি যাবতীয় ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত অন্যায় কাজ ও ক্ষতি থেকে বিরত থাকব, বিশেষত পুরুষ বা মহিলা, দাস বা স্বাধীন ব্যাক্তি দেহের অপব্যবহার করা থেকে।[২]

হিপোক্রেটিক স্কুলের যে এপিডেমিকস্ বুক-1, সেখানে আরো একটি বাক্যাংশ পাওয়া যায় যা উপরোক্ত বাক্যগুলির সাথে সমতুল্য- "রোগের সাথে মোকাবিলায় আপনার (চিকিৎসকের) আচরণে দুটি বিষয় অনুশীলন করতে হবে- হয় রোগীকে সাহায্য করুন অথবা তার কোন ক্ষতি করবেন না। "… and have two special objects in view with regard to disease, namely, to do good or to do no harm"[৩] এই যে সব নিষেধাজ্ঞা, তা স্পষ্ট করে, চিকিৎসকগণ পেশাগত ভাবে নিদিষ্ট কিছু নৈতিক বিধি দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই শপথটি বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে-উল্লেখযোগ্য সংশোধনগুলির মধ্যে 1948 সালে দ্বিতীয় জেনারেল অ্যাসেম্বলী অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশান দ্বারা সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় যে খসড়া হয়েছিল, যেটি জেনেভা ঘোষনা নামে পরিচিত, সেটি অন্যতম। এই খসড়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসকের উষ্ণতা, সহানুভূতি এবং রোগীর সাথে মানসিক - মেলবন্ধন শল্যবিদ বা সার্জনের ছুরি এবং রসায়নবিদ নির্মিত ওষুধের তুলনায় বেশী প্রভাবশালী হতে পারে। এই ঘোষণায় প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ-কেই বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই ঘোষনা পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালের অগস্ট মাসে অস্টেলিয়ার সিডনিতে অবস্থিত ২২তম বিশ্ব মেডিকেল এ্যাসেম্বলী কর্তৃক, ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে ৩৫ তম বিশ্ব মেডিকেল এ্যাসেম্বলি কর্তৃক ভেনিসে, ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে সুইডেনের স্টকহোমে ৪৬ তম WMA সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সংশোধিত তথা

পরিমার্জিত হয়। এরপর ২০০৫ সালের মে মাসে ফ্রান্সের ডিভোন-লেস-বেইনস-এ ১৭০ তম WMA কাউন্সিল অধিবেশন এবং ২০০৬ সালের মে মাসে ঐ একই স্থানে ১৭৩তম অধিবেশনে WMA কাউন্সিল কর্তৃক সংশোধিত হয়। ওয়ার্ল্ড মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশান পুণরায় ২০১৭ সালের ১৪ অক্টোবর ঐ শপথ নীতির পুনরায় সংশোধন করেন এবং ঐ সংশোধিত নীতিমালা অনুসারে সেখানে চিকিৎসা পেশার সদস্যরূপে চিকিৎসক শপথ গ্রহণ করেন –

১) আমি আমার জীবন মানবতার সেবায় উৎসর্গ করবো। ২) আমার প্রথম বিবেচ্য হবে রোগীর স্বাস্থ্য ও মঙ্গল। ৩) আমি রোগীর স্বশাসন এবং মর্য্যাদাকে শ্রদ্ধা করবো। ৪) আমি মানুষের জীবনকে সর্বোত্তম শ্রদ্ধা করবো। ৫) আমি বয়স, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, জন্ম, রাজনৈতিক সংযোগ, বিবাহ, চিকিৎসার সামর্থ্য, মানসিক ভারসাম্যহীনতা নিরপেক্ষ ভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবো। ৬) আমি, এমনকি রোগীর মৃত্যুর পরেও তার গোপনীয়তাকে রক্ষা করবো। ৭) আমি আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান রোগীর মঙ্গল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে ব্যবহার করবো। ৮) আমি কখনোই এমনকি বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন করলেও আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান ব্যক্তির অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহার করবো না। ৯) আমি বিবেক ও মর্য্যাদার সাথে এবং তৎসহ উত্তম চিকিৎসা অনুশীলন অনুসারে আমার পেশা অনুশীলন করবো। ১০) সর্বোচ্চ মনের যত্ন প্রদানের জন্য আমি আমার নিজের স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং ক্ষমতার প্রতি মনোযোগ দেবো। ১১) আমি এই প্রতিশ্রুতিগুলি আন্তরিকভাবে স্বাধীনভাবে এবং আমার সন্মানের জন্য রক্ষা করবো।

এই ২০১৭ সালের পরিমার্জনায় যেমন রোগীর স্বায়ত্বশাসনকে সন্মান করার প্রসঙ্গ আছে তেমনি রোগীদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের জন্য চিকিৎসা জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য শিক্ষক, সহকর্মী ও ছাত্রদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা তথা চিকিৎসকের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তাদের রোগীদের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৬০- এর দশকে হিপোক্রেটীস শপথকে এই দাবীতেই পরিবর্তন করা হয়েছিল যে সুচনা থেকেই প্রতিটি মানবজীবনের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা যেহেতু থাকা উচিত, তাই এই শপথটি বাধ্যতামুলকভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে হবে অর্থাৎ এই শপথ কোন দেবতার উপস্থিতিতে নয় বরং অন্যান্য ব্যক্তিদের সামনে গ্রহণ করা উচিত। তদনুসারে ১৯৬৪ সালে tufts University-র এ্যাকাডেমিক ডিন লুই লাসাগনা শপথটি পুণর্লিখন করেন, যেখানে গ্রীক দেবতাদের কাছে প্রার্থনার বিষয়টি বিযুক্ত করা হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অন্যতম চিকিৎসক পণ্ডিত চরকের নাম পাওয়া যায়, যিনি আর্য়ুবেদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন- তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দী। তাঁর রচিত চরক সংহিতায় বিভিন্ন রোগের কারণ, লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও তৎসংক্রান্ত নৈতিক বিবেচনা এবং ওষুধের বিভিন্ন দিকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ১২০টি অধ্যায় আছে, যা আটটি অংশে বিভক্ত- ১। সূত্রস্থানম্ ২। শারীর-স্থানম্ ৩। ইন্দ্রিয়-স্থানম্ ৪। কল্প-স্থানম্ ৫। সিদ্ধি-স্থানম্ ৬। বিমান-স্থানম্ ৭। নিদান-স্থানম্ ৮। চিকিৎসা-স্থানম্।

চরক-ই "প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম"- এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন বলে মনে করা হয়। কারণ চরক সংহিতায় বলা হয়েছে- "যে চিকিৎসক রোগীর শরীরে জ্ঞান ও বোধের প্রদীপ নিয়ে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন, তিনি কখনোই রোগের চিকিৎসা করতে পারেন না। তাঁর প্রথমে পরিবেশ সহ সমস্ত কারণ অধ্যয়ন করা উচিত, যা রোগীর রোগকে প্রভাবিত করে এবং তারপরে চিকিৎসার পরামর্শ দেবেন। নিরাময়ের চেয়ে রোগের উপস্থিতি রোধ করা আরো গুরুত্বপূর্ণ, চরক সংহিতাতেও রোগীর স্বার্থরক্ষাকেই চিকিৎসকের প্রধান উদ্দেশ্য রূপে নির্দিষ্ট করা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে নিজের স্বার্থ-রক্ষার জন্যেও রোগীর ক্ষতি করা সর্বতোভাবে অনুচিত।[৪] চিকিৎসককে অবশ্যই রোগীর প্রতি আন্তরিক হতে হবে। চরক হিত আয়ু এবং অহিত আয়ুর মধ্যে প্রভেদ সাধন করে হিত আয়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট রূপে সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণা-ভাব পোষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫] চরক রচিত চিকিৎকগণের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ বিধিতে সেই প্রাচীন কালেও গোপনীয়তা নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে রোগী বা রোগীর আত্মীয় স্বজনের স্বাস্থের প্রতি ক্ষতিকর হবে, রোগীর স্বাস্থ্য বিষয়ক এমন কোন তথ্য চিকিৎসকের কখনই প্রকাশ করা উচিত নয়।[৬] শুধু তাই নয় সেখানে আরো নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কোন চিকিৎসক অন্য চিকিৎসকের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ না হয়ে বরং প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধা পূর্বক চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা করবেন, যা তাঁকে সমৃদ্ধ করবে।[৭]

তবে, আচার্য চরক এমন কিছু নির্দেশ চরক সংহিতায় দিয়েছেন, যা নীতিগত ভাবে কতদূর পর্য্যন্ত গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যেমন- কিছু ক্ষেত্রে তিনি চিকিৎসক-কে চিকিৎসা কার্য থেকে বিরত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন- ১। মুমূর্ষু, রাজদ্রোহী, রাজদ্বিষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করা উচিত নয় । ২। অভিভাবকহীন মহিলার চিকিৎসা করা উচিত নয় কারণ সেক্ষেত্রে অপযশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ৩। (সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর) যাঁরা দরিদ্র, চিকিৎসার উপকরণ যোগান দেবার সামর্থ্য নেই। যাঁদের পরিচারক নেই, তাঁদের চিকিৎসাও চিকিৎসকের কর্তব্য নয়।[৮] উপরোক্ত নীতিগুলির প্রেক্ষিতে চরক-এর

বক্তব্য স্ববিরোধী বলে মনে হয়- কারণ একদিকে তিনি সর্ব-জীবের প্রতি মৈত্রী, করুণার কথা বলেছেন, তেমনই আবার মুমূর্ষ ব্যক্তির চিকিৎসা থেকে বিরত হওয়া, লিঙ্গভেদপূর্বক অভিভাবকহীন মহিলাদের চিকিৎসা না করার নির্দেশ দিয়েছেন- এমনকি আর্থিক বৈষম্যের ভিত্তিতে দরিদ্র ব্যক্তিকে চিকিৎসা না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু চিকিৎসকের উদ্দেশ্য যদি একমাত্র রোগীর স্বার্থরক্ষা হয় তাহলে লিঙ্গ-জাতি-ধর্ম- অর্থ রাজবন্ধুত্ব বা রাজশত্রুত্ব নির্বিশেষে রোগী মাত্রের ক্ষেত্রেই ঐ স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, যে কথা Declaration of Geneva তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

"I WILL NOT PERMIT considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient"[৯]

অর্থাৎ আমি (চিকিৎসক রূপে) ধর্ম, জাতীয়তা, জাতি, দলীয় রাজনীতি বা সামাজিক অবস্থানগত বিবেচনাকে আমার কর্তব্য এবং আমার রোগীর মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। হিপোক্রেটিক শপথের সাথে Declaration of Geneva র পার্থক্য হলো প্রথমটিতে রোগীর স্বার্থরক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে চিকিৎসক মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন, এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, যে সমস্ত চিকিৎসক এই পেশায় যুক্ত নন অর্থাৎ যাঁরা অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে কি এই নৈতিক বিধিগুলি আদৌ প্রযোজ্য? বস্তুতঃপক্ষে সাধারণভাবে অধিকাংশ চিকিৎসক, এমনকি যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে এই পেশায় জড়িত নন, তাঁরাও কিন্তু চিকিৎসা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত নৈতিক আচরণ বা ব্যবহার স্বীকার ও সমর্থন করে থাকেন-

1. রোগীর স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল-ই চিকিৎসকের প্রথম বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত ও রোগীকে সৎ উদ্দেশ্যের সাথে চিকিৎসা করতে হবে।
2. রোগীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত।
3. রোগীর স্বনিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচনের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত।
4. রোগীকে কোনভাবেই শোষণ করা উচিত নয়।
5. রোগীর সাথে সম্পর্ক হওয়া উচিত বন্ধুসুলভ ও সহযোগীতামূলক এবং সর্বোপরি কখনো তিনি রোগীর ক্ষতি করবেন না।
6. যেকোন প্রকার চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর সম্মতি প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুসারে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে,
7. চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতি তাঁর লক্ষ্য থাকা উচিত।
8. রোগীর যন্ত্রণায় তিনি সর্বদাই সহানুভূতিপ্রবণ ও প্রতিক্রিয়াশীল হবেন।

আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত নৈতিকতার সূত্রপাত হয় 1960 সালে। বিস্তারিত আলোচনার পরে চারটি নীতি বিষয়ে ঐক্যমত স্থাপিত হয়। যা চিকিৎসা নৈতিকতার চারটি স্তম্ভরূপে অভিহিত হয়ে থাকে-

1. স্বশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা (Respect for autonomy)
2. অ-অপকারিতা (Non-malefiafence)
3. উপকারিতা (Benficence)
4. ন্যায়পরায়ণতা (Justice)

"The four clusters are (1) respect for autonomy (a norm of respecting the decision making capacities of autonomous persons), (2) nonmaleficence (a norm of avoiding the causation of harm), (3) beneficence (a group of norms for providing benefits and balancing benefits against risks and costs), (4) justice (a group of norms for distributing benefits, risks and costs fairly)."[১০]

এই চারটি নীতি চিকিৎসকের সাথে রোগীর পারস্পরিক সম্পর্ক, রোগীর চিকিৎসা ও যত্নের বিষয়ে চিকিৎসকদের যে ধরণের আচরণ করা উচিত তা নির্দেশ করে। বিভিন্ন পরিস্থিতিগত জটিলতা সেগুলির মধ্যে কয়েকটি পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে। সেগুলির কারণে সিদ্ধান্তে অল্পবিস্তর পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু ঐ স্তম্ভগুলিকে বিবেচনার মধ্যে অবশ্যই রাখতে হবে।

এখন উপরোক্ত চারটি নীতি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

১। Respect for Autonomy বা স্বশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাঃ

'Autonomy 'শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'auto' এবং 'nomos' এই দুটি শব্দ থেকে। 'autos' শব্দের অর্থ self বা স্বীয় এবং"nomos' বলতে rule বা নিয়মকে বোঝায়। অতএব autonomy শব্দটির দ্বারা self-rule বা স্ব-শাসন বা স্ব-নিয়মকে বোঝায়। এই ধারণাটি দর্শন তথা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Gerald Dworkin দু'শতক আগে উল্লেখ করেছেন যে

moral autonomy বা নৈতিক স্ব-শাসনের ধারণাটি অন্ততঃ ছয়ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন যে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই স্ব-নির্ধারণের অনুমতি দেওয়া উচিত- "Rational individuals should be Permitted to be self-determining"

1. একজন ব্যক্তি তখনই নৈতিকভাবে স্ব-শাসনযুক্ত হবেন যদি এবং কেবলমাত্র যদি সে তার নিজের নৈতিক বিধি গঠন করে।
2. যদি সে তার নৈতিক বিধি নির্বাচন করে।
3. যদি তার নৈতিক বিধি কেবলমাত্র তার ইচ্ছে থেকে নিঃসৃত হয়।
4. কোন্ জাতীয় নৈতিক বিধি সে মেনে চলবে সে বিষয়ে স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
5. যে সমস্ত নৈতিক বিধি স্বীকার ও প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার দায়িত্ব যদি সংশ্লিষ্ট ঐ ব্যক্তির ওপরেই বর্তায়
6. ৬। যদি সে অন্য ব্যক্তিদের নৈতিক কর্তারূপে স্বীকার না করে বা নৈতিকভাবে কোন্ নীতিটি যথার্থ তা অন্যান্য মত নিরপেক্ষ ভাবে স্বয়ং বিচারপূর্বক গ্রহণ করে।

এই স্ব-শাসনের বৈশিষ্ট্যটি চিকিৎসা নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে প্রযোজ্য

রোগীর সিদ্ধান্ত-

1. যেকোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবে
2. যেকোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হবে
3. যেকোন অর্থপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাবতীয় সীমানা বা লক্ষণরেখা থেকে মুক্ত হবে

প্রতিটি পরিণত বয়স্ক এবং সুস্থ মনের অধিকারী মানুষের তার শরীরের সাথে কি ধরণের আচরণ করা হবে, তা নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে। তবে স্বায়ত্বশাসনের নীতি এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কখনই প্রসারিত নয় , যাদের সেই ক্ষমতা, দক্ষতা বা অধিকার নেই। যেমন-যারা কোন না কোনভাবে রাষ্ট্র বা প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাদের এই স্ব-শাসনের অধিকার স্বীকৃত নয়- জেলবন্দী অপরাধী, শিশু, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা সঠিক সিদ্ধান্ত নির্বাচনের সামর্থ্যের অভাবযুক্ত ব্যক্তি স্ব-শাসনের প্রয়োগে অক্ষম। অর্থাৎ রোগীকে সুস্থ, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তাকে অবশ্যই চিকিৎসা পদ্ধতির ঝুঁকি ও সুবিধাগুলি বুঝতে হবে।

যেকোন চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার পদ্ধতির জন্য রোগীর অবহিত সম্মতি বা informed consent থাকা প্রয়োজন- তবে সেক্ষেত্রেও শর্ত হল-রোগী বিষয়টি অবশ্যই বুঝবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবেন, স্বেচ্ছায় ঐ কাজে অংশ নেবেন এবং তারপর প্রস্তাবিত পদক্ষেপে সম্মতি দেবেন। এখানে আবার অন্য একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক- যদি কোন রোগী পূর্বে স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা সম্পন্ন হন কিন্তু বর্তমানে কোন কারণে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু তার পূর্বের প্রকাশিত পছন্দগুলি অবশ্যই সম্মান করা উচিত এবং এই রোগীদের ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন, যাঁরা তাঁদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন- সেক্ষেত্রে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারী ব্যক্তি দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বা তাঁর করা উচিত-

১মতঃ রোগী এই পরিস্থিতিতে কি চান বা চাইতে পারেন এবং/অথবা ২য়তঃ রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থরক্ষা বা উপকারিতা। J.S. Mill এবং Gerald Dworkin- ও নৈতিক স্বায়ত্বশাসনের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকৃতি প্রদান করে বলেছেন যে, স্বায়ত্বশাসন অবশ্যই সীমিত হওয়া উচিত সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে এর ফলে অন্যের ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে এটি ক্ষতি বিষয়ক নীতি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

Informed consent বা অবহিত সম্মতি প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো- রোগীর যেকোন চিকিৎসায় সম্মত হবার যেমন অধিকার আছে, তেমনি তা অস্বীকার করার-ও অধিকার আছে, আবার যদি একাধিক বিকল্প থাকে, সেগুলির মধ্যে যেকোন একটি নির্বাচন করার অধিকার-ও তার আছে। চিকিৎসক রোগীকে কখনোই কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারেন না, আর যদি রোগীর সেই ক্ষমতা না থাকে তখন চিকিৎসক বা রোগীর যিনি আইনসঙ্গত অভিভাবক তিনি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন এবং এঁরা নৈতিকভাবে এই জাতীয় রোগীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার রাখেন যতক্ষণ তারা রোগীর সর্বোত্তম মঙ্গলের বিষয়ে ভাবেন। এ বিষয়ে একটি বহুল প্রচলিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে- কোন একজন পরিণত বয়স্ক রোগী, যিনি যিহোবার সাক্ষী সম্প্রদায়ভূক্ত, তিনি কোন দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে অত্যাধিক রক্তপাতে মৃত্যুমুখী হতে পারেন এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যদি রক্ত গ্রহণে রাজি না হন (যেহেতু এই সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন যে, বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে যে কোন প্রকারের রক্ত সঞ্চালন পাপ) সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পক্ষে কি কর্তব্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃপক্ষে এই জাতীয় ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, চিকিৎসকদের রোগীর স্বায়ত্ব অধিকারকে অবশ্যই মান্যতা দিতে হবে এবং রোগীর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি-ও শ্রদ্ধা রাখতে হবে, যেখানে রক্ত স্থানান্তকরণকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু একই সাথে তাঁদের অন্য কোন উপায়ে রোগীটিকে সুস্থ করার বিকল্প ব্যবস্থা-ও গ্রহণ করতে হবে।

রোগীর স্বায়ত্ব অধিকার বা স্বশাসনের সাথে সম্পর্কিত অন্য এক বিশেষ নীতি হলো গোপনীয়তা বা confidentiality যেকোন সম্পর্কের স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রেই গোপনীয়তা রক্ষা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রূপে পরিগণিত হয় এবং চিকিৎসা নৈতিকতার প্রেক্ষিতেও এটি অন্যতম প্রধান শর্তরূপে স্বীকার্য্য। একজন চিকিৎসক আবশ্যিকভাবে তার রোগীর যাবতীয় তথ্য এবং পারস্পরিক আলাপচারিতা গোপন রাখবে এবং কোন কারণে চিকিৎসার স্বার্থে যদি সেই তথ্য অন্য চিকিৎসক বা রোগীর পরিবারের কাছে প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়, তাহলেও রোগীর সম্মতি ও অনুমতি বাধ্যতামূলক রূপে গণ্য হবে। এই নৈতিক নীতিটি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রোগী সংক্রান্ত যাবতীয় গোপনতাকে সম্মান করা চিকিৎসকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নীতিগত নয় আইনগত ভাবেও অবশ্যপালনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৬ সালে প্রণীত The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) অনুসারে চিকিৎসক অবশ্যই রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথির গোপনীয়তা সুরক্ষিত রাখবেন। HIPPA এ বিষয়েও নির্দেশ প্রদান করেছে যে ঐ গোপন তথ্য কোন পরিস্থিতিতে কারা দেখার অধিকারী এবং কারা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন রোগীর রোগসংক্রান্ত তথ্য গোপন অনৈতিক হতে পারে যদি তা রোগীর ক্ষেত্রে ক্ষতিকর পরিণতি তৈরী করে। আবার রোগীর বিষয়ে তথ্যাদি সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নেওয়ার জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত এমনকি স্থায়ীভাবে তার চাকরী চলে যেতে পারে।

তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে গোপনীয়তা নীতি রক্ষা না করাই নৈতিক ঔচিত্যের দাবী রাখে। বিষয়টি দুটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে কোন রোগী যদি এইডস্ রোগে আক্রান্ত হয় এবং এই তথ্য তার স্ত্রী বা যৌনসঙ্গীর কাছে গোপন রাখার অনুরোধ চিকিৎসকের কাছে জানায়, তাহলে ব্যাপকতর মঙ্গলসাধনের স্বার্থে ঐ গোপনীয়তা ভঙ্গ করাই উচিত হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণের স্বার্থে কোন দেশদ্রোহী রোগীর ব্যক্তিগত তথ্য গোপন না করে তা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে উন্মুক্ত করাই নৈতিকতা। বহু দেশেই চিকিৎসকদের নির্দেশ প্রদান করা হয়ে থাকে যে গুলির আঘাতযুক্ত রোগীর বিষয়ে আবশ্যিক ভাবে পুলিশ-কে জানাতে। কারণ নৈতিকতা সর্বদাই ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল তথা কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ কোন গোপন তথ্যের প্রকাশ যদি বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার পক্ষে সহায়ক হয় তাহলে তথ্য গোপনের নীতি পরিত্যাগ করাই চিকিৎসকের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে এবং সম্ভবতঃ এই কারণবশতঃ-ই অ্যামেরিকান এ্যাসোসিয়েশন তার ১৯৫৭ সালের মেডিকেল এথিক্সে উপদেশ প্রদান করেছে সে চিকিৎসকের মুখ্য উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রোগীর সেবা নয় বরং মানবতার সেবা করা; হিপোক্রিটিও শপথেও এই বক্তব্যই অনুরণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৯ সালে সংঘটিত 'তারাসফ বনাম ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ' এর আইনি বিবাদটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। এই কেসে গোপনীয়তা রক্ষার বিধিকে বৃহত্তর পরিস্থিতিতে লঙ্ঘন করা যেতে পারে বলে রায় দেয়, যদিও রায় দেওয়ার আগে দু'দল বিচারকের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা গিয়েছিল। ঘটনাটি এরকম: ১৯৬৯ সালে প্রসেনজিৎ পোদ্দার নামে এক ভারতীয় তরুণ মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লরেন্স ম্যুরের চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই মানসিক ভারসাম্যহীন ভারতীয় তরুণ তার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কে স্পষ্ট ভাবে বলেন যে তিনি তাতিয়ানা তারাসফ নামে এক তরুণীকে হত্যা করতে

চান। ডাক্তার লরেন্স ম্যুর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ক্যাম্পাস পুলিশকে জানান। পুলিশ প্রসেনজিৎ পোদ্দার কে আটক করে। কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তখন তাকে 'তাৎক্ষণিক বিপজ্জনক' হিসেবে আইনিভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাতিয়ানা বা তার পরিবারকে কেউ সতর্ক করেননি। কয়েক মাস পরে ২৭ শে অক্টোবর ১৯৬৯ সালে পোদ্দার সত্যিই তাতিয়ানা তারাসফ'কে হত্যা করে।

তাতিয়ানার পরিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে, তাঁর হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরেই। তার পরিবারের বক্তব্য ছিল: যদি ডাক্তার বা বিশ্ববিদ্যালয় তাতিয়ানাকে আগে সতর্ক করত, তাহলে হয়তো সে বাঁচতে পারত। এখানে মূল প্রশ্ন দাঁড়ায়- চিকিৎসক কি রোগীর গোপনীয়তা রক্ষা করবেন, নাকি সম্ভাব্য ভুক্তভোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে তথ্য প্রকাশ করবেন?

১৯৭৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়া সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিক রায় প্রদান করে, বিচারক বলেন- যদি রোগী কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যার মতো গুরুতর ও বিশ্বাসযোগ্য হুমকি দেয়, তাহলে চিকিৎসকের পক্ষে "Duty to warn" দায়িত্ব। অর্থাৎ সম্ভাব্য ভুক্তভোগীকে সতর্ক করতে তিনি দায়বদ্ধ; শুধু গোপনীয়তা রক্ষায় দায়িত্ব শেষ নয়। আবার ১৯৭৬ সালে চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়, অর্থাৎ মামলাটি পুনরায় শুনানি হয় এবং এক্ষেত্রে আদালত আরো স্পষ্ট ও বিস্তৃত সিদ্ধান্ত দেয়। আদালত বলে- চিকিৎসকের দায়িত্ব শুধু "Duty to warn" নয়, বরং "Duty to protect"ও বটে। পরিস্থিতি অনুযায়ী যেভাবে সম্ভব, সম্ভাব্য ভুক্তভোগীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা চিকিৎসককে নিতে হবে; যেমন- সরাসরি সতর্ক করা, পুলিশকে জানানো, রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এবং আদালত এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মন্তব্য করে- "The protective privilege of confidentiality ends where public peril begins". অর্থাৎ, জনসাধারণের নিরাপত্তা স্বার্থ গোপনীয়তার অধিকারের তুলনায় বৃহত্তর। এখানে পরিনামবাদী যুক্তি প্রাধান্য পেয়েছে- একজন নিরপরাধ মানুষের সম্ভাব্য মৃত্যু রোধকরন ভবিষ্যতে রোগীর চিকিৎসকের প্রতি আস্তাহানির আশঙ্কার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই মামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের বহু অঙ্গরাজ্যে " Duty to warn" এবং "Duty to protect" আইনগত ও নৈতিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব উপযোগীতাবাদী তত্ত্ব অনুসরণে বলা যায়, তথ্য গোপনের ফলের তুলনায় তথ্য প্রকাশের ফল যদি অধিক সার্বিক মঙ্গল তৈরি করে, তাহলে তথ্য প্রকাশ করাই উচিত- যদিও কান্টীয় নৈতিক মতবাদ অনুসারে ফলাফল নিরপেক্ষভাবে তথ্য গোপন যদি নীতি হয়, তাহলে তাই মান্য করা উচিত।

স্বশাসন বা স্বায়ত্ব অধিকারের নীতি লঙ্ঘনের ক্ষেত্র:

১। ক্ষতির নীতি (The warm Principle) - একজন ব্যক্তিকে (রোগী) অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখতে হবে। দৃষ্টান্ত - যদি কোন ব্যক্তির কোন সংক্রামক রোগ থাকে তাহলে সেই ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও, তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ বা সীমিত করা যেতে পারে বা তাই কর্তব্য।

2। পিতৃতান্ত্রিক নীতি (The Principle of Paternalism)-

কোন একজন ব্যক্তি (রোগী)- কে তার নিজের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং সেই কারণবশতঃ তার স্বায়ত্বশাসনের অধিকার খর্ব করা যেতে পারে, যেমন-কোন ব্যক্তি যদি বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ও চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করে তাহলেও তাকে বিষমুক্ত করার প্রচেষ্টা চিকিৎসকের অবশ্যই করা উচিত কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে তার সাময়িক অনিচ্ছাকৃত আচরণ বা সিদ্ধান্ত, যা সে চূড়ান্ত হতাশা আক্রান্ত হয়ে বা পর্যাপ্ত তথ্যের অজ্ঞতাবশতঃ গ্রহণ করেছে, তার পরিণাম থেকে রক্ষা করা হয়। এটি Weak Paternalism নীতিরূপে অভিহিত হয়। অন্যদিকে Strong Paternalism এর নীতিটি হল, যখন রোগীর স্বায়ত্বশাসনকে সীমিত করে , সেই রোগীর উপকারের জন্য হস্তক্ষেপ করা হয়। এক্ষেত্রে রোগীটির চরম, অস্বাভাবিক, স্বতঃগৃহীত ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত, থেকে তাকে রক্ষাকরার উদ্দেশ্যে তার এই ইচ্ছে বা নির্বাচন বা সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই জাতীয় কর্তৃত্বমূলক মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ডন করা হয় কারণ তা ব্যক্তির প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই একজন ন্যায়শীল কর্তার বসতি আছে এবং সেই কারণে তাদের মতামতের প্রতি অবশ্যই নৈতিক সমতার নিরিখে সমান শ্রদ্ধা থাকা উচিত। এই জাতীয় সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যায় যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা তার স্বশাসনকে সীমিত করা হচ্ছে সেখানে,

১) স্বাধীনতা হরণের তুলনায় মঙ্গলজনক সিদ্ধান্তের মাত্রা বেশী

২) ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থানগত কারণে প্রকৃত তথ্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্বাচন রোধকরণ

৩) উপকারিতার মাধ্যমে ক্ষতির আশংকাকে অতিক্রমণ।

অতএব ক্ষতি প্রতিরোধ বা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নৈতিকতাকে আইনসিদ্ধ করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তির স্ব-শাসনের অধিকার সীমিত করণ সঙ্গত। দৃষ্টান্ত:- শিশু এবং তার পিতা-মাতার অস্বীকৃতি সত্ত্বেও রোগের বিরুদ্ধে টীকাকরণ প্রভৃতি এতদ্‌ভিন্ন সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে-ও স্বায়ত্বশাসনকে ক্ষুণ্ন করা যেতে পারে বা তা করা উচিত।

Principle of Non-malificence বা অপকার তথা ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকার নীতি:

এই নীতিটি Benificance বা উপকারিতা তথা মঙ্গলসাধনের নীতিটির নঞর্থক অভিব্যক্তি, যার মধ্যে চূড়ান্ত সদর্থকতার ভাবনা রয়েছে। এটির মধ্যে শুধুমাত্র চিকিৎসা নৈতিকতার নয়, সার্বিকভাবে নৈতিকতার মূল চাবিকাঠি নিহিত- 'Do no harm' বা ক্ষতি কোর না। এই নীতিটির উৎস বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রাপ্ত হয় না, হিপোক্রেটিও শপথের কোন কোন প্রাচীন সংস্করণে একটি নীতির সন্ধান পাওয়া যায়- ‘‘ক্ষতি করা থেকে বিরত হাওয়া’’- যেটি উপরোক্ত নীতিটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অতএব এই নীতি অনুসারে কোন চিকিৎসক ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাপূর্ব্বক কোন রোগীর ক্ষতি করবেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, একজন শল্যচিকিৎসক কখনোই কোন রোগীকে অ-জীবানুমুক্ত পরিবেশে অস্ত্রাপচার করবেন না কারণ তা রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর হবে এবং এক্ষেত্রে হিপোক্রেটিক শপথ হলো -

I will use treatment to help the sick according to my ability and judgement but I will never use it to injure or wrong them"[১১]

অর্থাৎ আমি অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য আমার সামর্থ্য, শিক্ষা অনুসারে চিকিৎসা ব্যবহার করবো কিন্তু কখনোই আমি তা তাদের ক্ষতি অথবা আঘাত করার জন্যে ব্যবহার করবো না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সাময়িক ক্ষতি তুলনামূলক ভাবে স্থায়ী উপযোগীতার ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। যেমন- যেকোন অস্ত্রোপচারের জন্য ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করে রোগীর শরীরে ক্ষত করতে হয় যার ফলে কিছু রক্তপাত ঘটে বা, অপকার সাধন হয় কিন্তু তার মাত্রা রোগীর সুস্থতা বা উপকারের প্রেক্ষিতে সামান্য হওয়ায় এক্ষেত্রে নৈতিকতা পূর্নভাবে রক্ষিত হবে। একই বক্তব্য কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে বলা যায় যে রোগীর সুস্থ করার সদ্ অভিপ্রায় পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও যদি মন্দ পরিণাম উদ্ভূত হয় অর্থাৎ রোগীর মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে অপকার সাধিত হওয়ায় অ-আপকারিতা নীতির লঙ্ঘন হয়েছে বলা নিশ্চিত ভাবেই উচিত নয়।

অপকার না করার দায়বদ্ধতা উপকারীতা নীতির তুলনায় অনেক বেশী কঠোর এবং উপযোগী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপকার না করা, উপকার করা বা সাহায্য করা কে অতিক্রম করে যায়। এই নীতি ঐচ্ছিকভাবে সেই জাতীয় যাবতীয় আচরণ বা সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করে, যা ক্ষতির কারণ হয়। যখন বলা হয় X. Y - এর ক্ষতিসাধন করেছে- তখন তার অর্থ হল X. Y এর ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রতিকূল প্রভাব তৈরী করেছে। এখন ক্ষতি দ্বিবিধ হতে পারে - শারীরিক বা দৈহিক এবং মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক। কিন্তু সাধারণতঃ শারীরিক ক্ষতির কথাই বলা হয়ে থাকে। যেমন চিকিৎসা সংক্রান্ত নৈতিক বিতর্কের বিষয়গুলি- স্বস্তিমৃত্যু সহায়তামূলক আত্মহত্যা প্রভৃতি এই অ-অপকারমূলক নীতির সাথে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরু না করা এবং ক্রিয়াশীল চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া ঐ নীতির সাথে কতোটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ উভয়ই রোগীকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়ার এমনকি হত্যার দৃষ্টান্ত রূপে গ্রাহ্য হতে পারে।

Principle of Beneficence বা মঙ্গল সাধনের নীতিঃ

এই নীতিটির সুবিধা হল non- Beneficence বা ক্ষতি না করার সদর্থক দিক, এই নীতি রোগীর মঙ্গল বা সুবিধার্থে আচরণ করার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বাধ্যবাধকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ‘Beneficence’ বা ‘উপকারিতা’ শব্দটি পরোপকার, করুণা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, অপরের হিতসাধনের মানসিকতা প্রভৃতি মানবিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। নৈতিক বিভিন্ন তত্ত্বের ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রভাব তথা গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপকারিতা নীতির সর্বোচ্চ প্রয়োগের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত মিল প্রবর্তিত উপযোগীতাবাদী ভাবনা। তাঁর মতে, যে কোন আচরণ বা ক্রিয়ার ন্যায্যতা সকল সত্তার পক্ষে আনন্দ সৃষ্টির প্রবণতার হার অনুসারে নির্ধারিত হবে এবং অযথার্থ হবে যদি তার বিপরীত ঘটে। এই নীতি একটি কল্যাণমূলক, সরল তথা যৌক্তিক নীত যাকে নীতিশাস্ত্রের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায়। আবার কান্ট যদি-ও উপরোক্ত উপযোগবাদী তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন কিন্তু নৈতিক জীবনে উপকারিতা নীতির গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি এবং মত প্রকাশ করেছেন যে প্রত্যেকেরই তার সামর্থ্য অনুসারে প্রতিফলের আশা বিযুক্তভাবে

উপকার সাধন করা কর্ত্তব্য। তবে ঐ কর্ত্তব্যের সীমা বা তা কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হবে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

চিকিৎসা পরিষেবার প্রকৃতি ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে উপকারিতা নীতির অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। কারণ চিকিৎসা সর্বার্থে একটি কল্যাণমূলক উদ্যেগ, যার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসকদের পেশাদারী কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, দায়িত্ব গড়ে ওঠে। তাছাড়াও রোগীর অধিকার রক্ষা, ক্ষতি প্রতিরোধ করা , ক্ষতির কারণগুলি অপসারণ করা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাহায্য করা, বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা-এই সমস্ত-ই রোগীর মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যকল্পে চিকিৎসকের অবশ্যকর্তব্য। এক্ষেত্রে দুটি সাধারণ নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়, যার ওপর ভিত্তি করে এই নীতিটি প্রতিষ্ঠিত- (১) ক্ষতি করো না (২) সম্ভাব্য সুবিধা সর্বাধিক করো ও সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ কমাও। অর্থাৎ চিকিৎসকের মধ্যে অন্যের মঙ্গলসাধনের বা হিত-সাধনের প্রবণতা বা সদ্ গুণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে হবে। এই নীতিটির মধ্যে একটি সামগ্রিক রোগীকেন্দ্রিক যত্নমূলক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

যদি চিকিৎসকের প্রাথমিক কর্তব্য রোগীর মঙ্গলার্থে কর্ম সম্পাদন হয় তাহলে ই রোগীর স্বাধীন নিজস্ব সিদ্ধান্তকে উৎসাহিত করা চিকিৎসকের কর্তব্যের অর্ন্তভূক্ত হবে না। কিন্তু একথা-ও অস্বীকার করা যায় না যে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থ তাঁর বা তাদের নির্বাচিত সিদ্ধান্তের সাথে গভীর ভাবে জড়িত। তবে , তা " স্বাভাবিক পরিস্থিতি" তে। বৃদ্ধ কোন মহিলা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যদি নিজের জন্য ব্যয়বহুল চিকিৎসা না করাতে চান, তাহলে সেই নির্বাচন কোনভাবেই তার সর্বোত্তম স্বার্থ সাধন করে না এবং সেক্ষেত্রে ঐ নির্বাচনকে মান্যতা দেওয়ার-ও কোন কারণ থাকে না।

Principle of Justice বা ন্যায়পরায়ণতার নীতি:

ন্যায়পরায়ণতার ধারণাটি নৈতিকতার সাথে প্রাচীনকাল থেকেই এক অবশ্যম্ভব সম্পর্কে যুক্ত রয়েছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর দ্য রিপাব্লিক গ্রন্থে এই ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে তিনি গ্রীক শব্দ 'Dikaisyne' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা নৈতিকতা বা ধার্মিকতার অর্থ বহন করে। প্লেটোর মতে, ন্যায়বিচার হলো আত্মার গুণ, যার প্রভাবে মানুষ প্রতিটি বস্তু থেকে স্বার্থপর তৃপ্তিলাভের অযৌক্তিক আকাঙ্খার পরিবর্তে সাধারণের সুবিধার্থে একটি একক কর্ম সম্পাদনের জন্য নিজেদেরকে সংহত করে অর্থাৎ তাঁর কাছে ন্যায়পরায়ণতা সহজাত। এটি আত্মার গুণ এবং ব্যক্তির বিবেকের কণ্ঠ। অবশ্য দ্য রিপাব্লিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্লেটোর পূর্ব্বে ও ন্যায় বিচারের বহু তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি তিনি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন, যেমন- সেফালাস যিনি প্রাচীন ব্যবসায়ী শ্রেণীর ঐতিহ্যবাহী নৈতিকতার প্রতিনিধি ছিলেন, সঠিক আচরণের সাথে ন্যায়বিচারকে সম্পর্কিত করে বলেছিলেন - সত্য কথা বলা এবং ঋণ পরিশোধের মধ্যেই ন্যায়বিচারের প্রকাশ ঘটে। আবার পোলেমার্কাস ন্যায়পরায়ণতাকে বন্ধুদের সাহায্য করা এবং শত্রুদের ক্ষতিসাধন করার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং থ্র্যাসিমাকাস যুক্তি প্রদান করেন যে ন্যায় পরায়ণতা শক্তিশালীদের স্বার্থ। বক্তব্যগুলি সক্রেটিস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে দ্য রিপাব্লিক গ্রন্থে।[১২]

Aristotle এর মতে সমান অবশ্যই সমানভাবে বিবেচিত হবে এবং অসম অসমভাবে, কিন্তু এমন মানদন্ড নির্ধারণ করা কঠিন, যা নিশ্চিত করবে কোন্ শ্রেণীর কোন্ সমানরা সমানভাবে বিবেচিত হবে এবং কারাই বা অসমানভাবে- এই সমতার সংজ্ঞা বিষয়েও বিতর্ক আছে।

দৃষ্টান্ত প্রদান করে বলা যায়, ধরা যাক কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দেবেন (যাদের চিকিৎসাবীমা আছে তাদের) কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই এই নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না যে এই শ্রেণীর বাইরে যে সমস্ত ব্যক্তির সমান প্রয়োজন আছে তাদের সুযোগ না দেওয়া উচিত নাকি অনুচিত।

আবার যদি প্রয়োজনকেই মানদণ্ড রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে সামাজিক সম্পদ প্রয়োজন অনুসারে বন্টন করাকেই ন্যায়সঙ্গত বলতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে কিভাবে বোঝা হবে কার প্রয়োজন আছে? ব্যক্তি সাপেক্ষে তা নির্ধারিত হলে আরো সমস্যা তৈরী হবে। বিষয়টি নিম্নোক্ত ভাবে বোঝা যেতে পারে-

'X' ব্যক্তির কোনকিছুর প্রয়োজন আছে-এর অর্থ হলো যে, ঐ বিষয়টি ব্যতীত 'X' ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা অন্ততঃ নিশ্চিতভাবে তার ওপর কোন নঞর্থক প্রভাব পড়বে। কিছু বিষয় থাকে যা আবশ্যিক ভাবে প্রয়োজন বা ন্যূনতম প্রয়োজন এবং ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হলে তার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বেই, যেমন- অপুষ্টি, শারীরিক আঘাত প্রভৃতি। সাধারণভাবে দার্শনিকগণ যেভাবে justice বা ন্যায়পরায়ণতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অনুসারে প্রত্যেকের কাছে সমান অংশ থাকবে, প্রত্যেকে প্রয়োজন অনুসারে পাবে, প্রত্যেকে প্রচেষ্টা অনুসারে পাবে, প্রত্যেকে তার অবদান অনুসারে পাবে, প্রত্যেকে তার

যোগ্যতা অনুসারে পাবে, প্রত্যেকে মুক্ত বাজার বিনিময় অনুসারে পাবে। কিন্তু সমস্যা হলো এক্ষেত্রে যদি উপরোক্ত কোন দুটি নীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, যা প্রায়শঃই হয়ে থাকে, তাহলে কোন নীতিটি অগ্রাধিকার পাবে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কে অগ্রাধিকার পাবেন?

১) তালিকাতে যার নাম প্রথমে আছে, ২) যার জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন ৩) যিনি অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে চাইছেন-

এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, যদিও যথাযথ নির্দিষ্টকরণ এবং নীতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে -এই সমস্যা দূর করা সম্ভব। নীতিগত ভাবে 'ন্যায়পরায়ণতা' বা Principle of Justice এর প্রসঙ্গে জন রলসের তত্ত্বের উল্লেখ ব্যতীত আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রলসের ন্যায়বিচারের তত্ত্বটি মূলতঃ সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর মতে যেকোন সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান গুলি এমন ভাবে তৈরী করা উচিত যাতে সব পক্ষের কাছে সামাজিক প্রাথমিক পণ্যগুলি, যেমন - অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ, আয় এবং সম্পদ এর সুষ্ঠ ও ধারাবাহিক বন্টন নিশ্চিত করা যায়। রলস্ ন্যায়বিচারের দুটি নীতির কথা বলেছেন-

১। সমান স্বাধীনতার নীতি, যা অনুসারে সর্বাধিক বিস্তৃত মৌলিক স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার আছে, যা অন্যদের অনুরূপ স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১৩]

২। পার্থক্যের নীতি এবং সুযোগের ন্যায়-সমতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য গুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তারা - ক) উভয়ই সর্বনিম্ন সুবিধাপ্রাপ্তদের সর্বাধিক সুবিধার জন্য হয়। খ) সুযোগের ন্যায্য সমতার শর্তে সকলের জন্য উন্মুক্ত কর্মসংস্থান এবং অবস্থান সংযুক্ত।

রলসের মত অনুসারে একটি ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্য-পরিষেবা পদ্ধতি অবশ্যই সকলের জন্য "fair equality of opportunity" বা সুযোগের ন্যায্য সমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে । অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেক বন্টন এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি ন্যায়সঙ্গতভাবে পেতে পারে। অসুস্থতা, শারীরিক নানাবিধ অসামর্থ্য হলো ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা যা তাকে তার জীবন সংক্রান্ত করার ক্ষেত্রে বাধা দেয় এবং সেই কারণবশত তারা ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব, সমাজে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যা ব্যক্তিকে ঐ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমে সাহায্য করবে- যেমন, যেসব শিশুর -মানসিক অসামর্থ্য বা শারীরিক অক্ষমতা আছে, ব্যয়বহুল হলেও তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা মূলক কর্মসূচি থাকা উচিত।

অতএব চিকিৎসা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা হবে পরিচর্য্যাধীন সব রোগীর চিকিৎসক কর্তৃক ন্যায্য চিকিৎসা। এই নীতি কোন রোগীর ক্ষেত্রে কোন কারণেই বৈষম্যকে স্বীকার করে না। এবং নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, শুধুমাত্র রোগীর শারীরিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলে। যে শপথ Declaration of Geneva তেও নেওয়া হয়েছিলো। নিঃসন্দেহে এই নীতির স্বীকৃতি সর্বজনগ্রাহ্য, কারণ কোন চিকিৎসকেরই নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন ঘৃণা বা অন্ধবিশ্বাস বশতঃ বা জাতিগত, লিঙ্গগত কারণে রোগীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয় । কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত ন্যায়পরায়ণতা সেইসব নৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত হয় যা রোগীকে অতিক্রম করে সমাজে প্রতিক্রিয়া তৈরী করে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক এবং তার সহকর্মীদের সুরক্ষাতেও বিঘ্ন তৈরী করে। যেমন-কোন কুখ্যাত অপরাধী গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চিকিৎসকের কাছে এলে ন্যায়পরায়ণতা নীতির ভিত্তিতে চিকিৎসক তার যথাযথ যত্ন নেবার পরে সে ঐ চিকিৎসককে গোপনীয়তার স্বার্থে হত্যা করলো-পরবর্তীকালে কোন চিকিৎসক কি এইরকম পরিস্থিতিতে, ন্যায্যতার নীতি অনুসরণ করবেন বা তাঁর করা আদৌ কি করা উচিত। এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হয়।

পরিশেষে চিকিৎসা-নৈতিকতার গুরুত্ব বা তাৎপর্য্য বিষয়ে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। সাধারণ মানুষকে তার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে চিকিৎসকের ওপর আবশ্যিকভাবে নির্ভর করতেই হবে। কারণ তাদের নিজেদের পক্ষে এই দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো যার ওপর এ বিষয়ে পেশাগত ভাবে নির্ভর করতে হয়, তিনি বহু অন্যায় সুযোগ-সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করেন। যেমন- কোন ব্যক্তি ভয়ংকর অসুস্থ না হলেও চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তার অসুস্থতাকে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করে তাকে নানাবিধ ব্যয়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত জটিল পদ্ধতিতে বেশী অর্থদণ্ড দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণে বাধ্য করতে পারে। আবার বহু চিকিৎসক এমন উচ্চমার্গে অবস্থান করেন যে তিনি রোগী বা তার

আত্মীয় পরিজনদের সাথে রোগ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনই মনে করেন না। এবং সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে চরম বিরক্তির মুখোমুখি হতে হয়।

রোগীদের প্রায়শই এই অভিযোগ থাকে যে চিকিৎসকরা তাদের কথা-মনোযোগ দিয়ে শোনেন না বা যথেষ্ট সময় দিয়ে পরীক্ষাও করেন না।

বাস্তবিক পক্ষে চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিক কালে বহু দেশেই এমন অসততাপূর্ণ হয়ে গেছে যে পেশারূপে চিকিৎসা-কে মহৎ আখ্যা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে যদি নৈতিকতার বেড়াজাল থাকে, তাহলে তা পেশাটিকে যেমন যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে, তেমনি রোগীর প্রতি অবহেলা বা অন্যায় আচরণের মতো অনৈতিক অভ্যাসে কিছু মাত্রায় অন্ততঃ বাধা সৃষ্টি করে। তাছাড়াও চিকিৎসা সংক্রান্ত যেসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নির্বাচনের বিষয়ে moral dilemma বা নৈতিক দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, সেখানে এই নৈতিক বিধিগুলি সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। অর্থাৎ চিকিৎসা নৈতিকতা ঐ বিচারের ক্ষেত্রে একটি কাঠামো প্রদান করে, যা নৈতিকভাবে সঠিক এবং সংশ্লিষ্ট রোগীর জন্য সর্বোত্তম মঙ্গলসাধক। যেসব ক্ষেত্রে এই জাতীয় নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকে তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে-

১। রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে তাকে এ বিষয়ে অবগত করা।

২। অনারোগ্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটানোর অনুরোধে স্বীকৃতি।

৩। রোগীর সম্মতি ব্যতীত সামাজিক সার্বিক মঙ্গল জনিত কারণে তার মৃত্যুর পর অঙ্গ প্রতিস্থাপন।

৪। চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট চিকিৎসা পণ্য বা পরীক্ষা কেন্দ্র প্রচারে অনুমতি।

৫। অঙ্গ দানের ক্ষেত্রে ‘পারিবারিক আপত্তি' বা 'family veto'-র গুরুত্ব।

এরূপ নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত আচরণ নির্দেশিকা প্রয়োজন।

সমাজের উন্নতি তথা কল্যাণ সাধনের এক অন্যতম প্রধান কারিগর হলেন চিকিৎসক গোষ্ঠী, যাঁদের সাহায্যে সর্বাধিক রোগমুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক বসতি গড়ে উঠতে পারে। আবার এঁরাই কিন্তু সমাজের অবনমনের জন্যও দায়বদ্ধ হতে পারেন। তাই তাঁদের আচরণকে নৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নির্দেশিকা অবশ্য প্রয়োজন। এবং সেই নির্দেশিকায় আলোচিত নীতিগুলির সাথে নিম্নোক্ত নীতি-গুলির অন্তর্ভূক্তি নির্দেশিকাটিকে নিশ্ছিদ্র করে তুলবে-

১। রোগীর সাথে কোন অবস্থাতেই প্রতারণা না করা।

২। পেশাগত ভাবে কোন রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করলে, রোগী সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করা বা বিশেষ অসুবিধার ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বশতঃ অন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে রোগীর দায়িত্ব অর্পণ করা।

৩। চিকিৎসা-পেশার সদস্য রূপে ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের জন্য নিজের নামে বা পরিবারের অন্য কারো নামে কোন ওষুধ উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান গড়ে না তোলা।

৪। জরুরী প্রয়োজনে সহকর্মীদের সাহায্য নেওয়া বা তাদের সাহায্য করা।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নৈতিকতা কোন স্থবির, অনড় বিষয় নয়। প্রয়োজন অনুসারে মানুষের স্বার্থে কালের পরিবর্তনের সাথে নৈতিকতার-ও পরিবর্তন কাম্য। বস্তুতঃ ঐতিহ্য ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হওয়া উচিত যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা পরিণতিগত ভাবে মঙ্গলজনক জনক বা শুভ। ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ অতি প্রাচীন ঐতিহ্যরূপে বিবেচিত হলেও তার পরিবর্তনের শুভত্ব আজ সন্দেহাতীত রূপে স্বীকৃত-চিকিৎসা-নৈতিকতার প্রসঙ্গেও এই কথা প্রযোজ্য।

সুচীপত্র

1. (Edelstrin luduing (1943). The Hippocratic Oath: Text, Yranslations and Interpretation. Johns Hopkins Press, O-56. ISBN 978-0-8018-0184-6)

2. Hippocrates of cos (1923) "The oath" locb classical Library 147: 289-299
3. of the Epidemics By Hippocrates Written 400 B.C.E Translated by Francis Adams Book -1
4. চরক সংহিতা ২য় খণ্ড, ১৯৯৪, বিমান স্থান, অষ্টম অধ্যায় পৃষ্টা-১৩৮
5. চরক সংহিতা ১ম খণ্ড, ১৯৯৪, সুত্র স্থানম, ত্রিংশ অধ্যায় পৃষ্টা-৩৫৭
6. চরক সংহিতা ২য় খণ্ড, ১৯৯৪, বিমান স্থান, অষ্টম অধ্যায় পৃষ্টা-১৩৮
7. চরক সংহিতা ২য় খণ্ড, ১৯৯৪, বিমান স্থান, অষ্টম অধ্যায় পৃষ্টা-১৩৮
8. চরক সংহিতা ২য় খণ্ড, ১৯৯৪, বিমান স্থান, তৃতীয় অধ্যায় পৃষ্টা-৯৭
9. International Code of Medical Ethics, Adopted by the Third General Assembly of THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION LONDON, England, October 1949
10. Principles of Biomedical Ethics, Fifth Edition, tom L Beauchamp and James Childress, Page 12, Oxford University Press, ISBN- 0-19-514331-0- ISBN-)-19-514332-9
11. The Hippocratic oath BMJ 1998 Oct24:371(7166):1110
12. Plato's concept of Justice: An Analysis D.R. Bhandari, J.N.V University. Bu.cdu\wcp\papers\Anci\Ancibhan.htm
13. Rawls, John (1999). A Theory of Justice. Revisited Edition. P.266. ISBN 0674000781.